বিশ্লেষণের আলোকে বাংলা ছোটগল্প

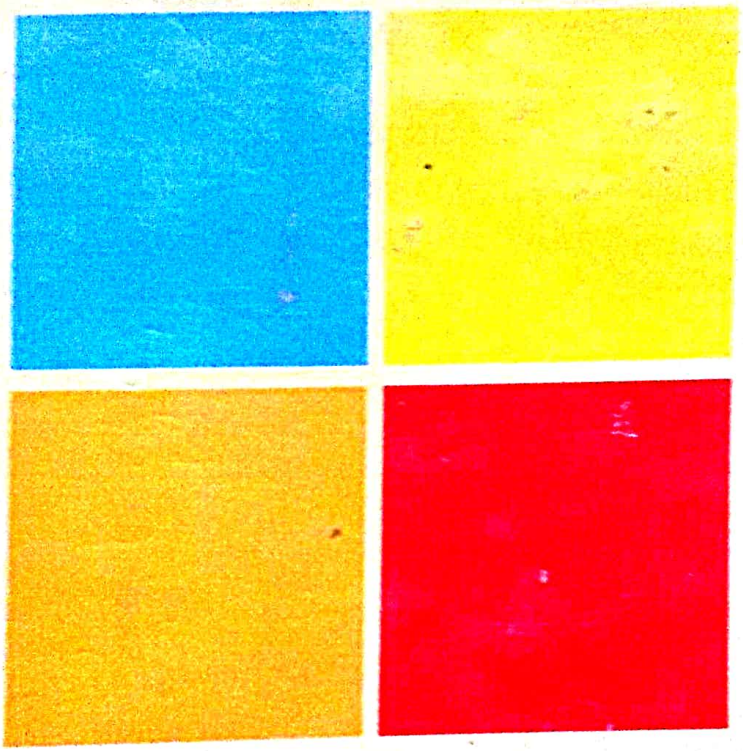

সম্পাদনা
মনোজ মণ্ডল
শ্রেয়া মণ্ডল

ভূমিকা : ড. তপনকুমার বিশ্বাস

Bislesoner Aloke Bangla Chotogalpo (বিশ্লেষণের আলোকে বাংলা ছোটগল্প)—Bengali short stories have been deeply discussed in this book Edited by Dr. Manoj Mandal & Shreya Mondal and pulished by Adhoyon publication, College Street, Kolkata-73, Februay 2022, Rs. 450.

ISBN : 978-93-86028-54-9

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ফেব্রুয়ারী ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকদ্বয়

প্রচ্ছদ : অলোককুমার উপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস : রেনবো, রামকমল স্ট্রীট, খিদিরপুর, কলকাতা – ৭০০ ০২৩

মূল্য : চারশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

১। প্রসঙ্গ ছোটগল্প
ড. অচিন্ত্য দে ১৩

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কুড়ানো মেয়ে' : বিশ্লেষণের আলোকে
ড. সঞ্জয় প্রামাণিক ২৫

৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিবাহের বিজ্ঞাপন'
ঝুমা নস্কর ভাণ্ডারী ৩৫

৪। বাঙালির অস্মিতা ও শ্রীপতি সামন্ত
ড. শংকর প্রসাদ মাঝি ৪৫

৫। হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে : এক বিচিত্র চরিত্রের কথা
বৈশাখী গোস্বামী ৫৬

৬। হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে : জীবনচিত্রণের আঙ্গিক দস্তাবেজ
ড. উত্তম বিশ্বাস ৬১

৭। বিশ্লেষণের আলোকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প 'মশা'
রাজু মণ্ডল ৬৭

৮। আঁধার রাতে চোরা পথের বাঁকে : প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে'
ক্লেদজ শিল্পের শতদল
অজয়কুমার দাস ৭৯

৯। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এবং তাঁর 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'
ড. অনিকেত মহাপাত্র ১০০

১০। রাজশেখর বসুর 'উলটপুরাণ' : হাস্যরসিকের প্রতিবাদী কণ্ঠ—
ড. সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ১০৮

১১। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চোর'
শ্রেয়া মণ্ডল ১১৭

১২। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' – পরিণতির সন্ধানে
ড. অজয় মণ্ডল ১২৭

১৩। সুন্দর ও অসুন্দরের দ্বিরালাপ : প্রসঙ্গ সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্'
ড. নবনীতা বসু ১৪৮

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিবাহের বিজ্ঞাপন'

ঝুমা নস্কর ভাণ্ডারী

ছোটগল্পে জীবনের কোন খণ্ডমুহূর্ত বা স্বল্প অবকাশকে মূর্ত করে তোলা হয়। ছোটগল্প লেখকের মানস প্রতীতিজাত এক সংক্ষিপ্ত, সংহত, একমুখীন লক্ষ্যে তীব্রগতিতে ধাববান অখণ্ড গদ্যকাহিনী, যেখানে বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন ঘটে। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ সমাদৃত। তিনি জীবনের লঘু দিকটিকে কৌতুক-হাস্যে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পের প্রাণসঞ্চার করেছে একটা প্রসন্ন হাসির দীপ্তি। এ বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— ''জীবনের উপরিস্তরের খণ্ডাংশকেই তিনি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিতেন...ইহার উপরিস্তরের লঘু তরলায়িত এবং কৌতুককর পরিবেশই প্রধানতঃ তাঁহার কথাসাহিত্যের ভিত্তি। তিনি ছিলেন হাস্যরসিক, ইংরেজীতে যাহাকে humourist বলে, তিনি তাহাই। তাঁহার হাস্যরসে জ্বালা নাই, কারণ তাহা ব্যঙ্গাত্মক নহে।''

তাঁর কারুণ্য আমাদের হৃদয়ের ওপর কিছুক্ষণের জন্যে মেঘছত্র মেলে ধরে। শান্তরসাশ্রিত তাঁর ছোটগল্প বারবার পাঠ করা যায়। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা এরকমই একটি বহুপঠিত কৌতুকরস সমৃদ্ধ ছোটগল্প 'বিবাহের বিজ্ঞাপন'।

২

হালকা হাসির ভেলায় ভেসে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৩ খ্রিঃ ৩রা ফেব্রুয়ারি পূর্ব বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস হুগলি জেলার গুরাপ গ্রামে। গ্রামের স্কুল থেকে শুরু করে বিলেত পর্যন্ত তাঁর পড়াশোনার ক্ষেত্র। পরবর্তীকালে নাটরের রাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের উৎসাহে মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ভারতী পত্রিকায় কবিতা রচনার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু। 'শ্রীমতি রাধারানি দেবী', 'শ্রী জানোয়ার চন্দ্র শর্মা' ছদ্মনামে তিনি লেখালেখি করেছেন। তাঁর লেখা ১৪টি উপন্যাস ও ১০৮ টি গল্প নিয়ে ১২টি গল্পসংকলনের সম্ভার আছে বাংলা সাহিত্যে।

ঔপন্যাসিক হলেও সরল অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখক হিসাবে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সমধিক জনপ্রিয়। তাঁর গল্পের মুখ্য স্থান অধিকার করেছে প্রায় শতাব্দী পূর্বের বাঙালি মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল ভদ্রপরিবার। তত্ত্বকথা বা মনোবিশ্লেষণের কৌশল নয়, সাধারণ আটপৌরে জীবনের লঘু ও দুর্বল দিককে কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সমসাময়িক লেখক হলেও তিনি ছিলেন রবীন্দ্র ধারার সার্থক উত্তরসাধক। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মধ্যবর্তী পর্যায়ের সার্থক কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর বিশেষ অবদান আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে

বলেছেন—''ছোটগল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যরশ্মির মতো।''

তাঁর গল্পের সৌন্দর্য সম্পর্কে ১৯১৩ লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ''হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপরে পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, কোথাও কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।''

বিদেশি সাহিত্যে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। তাঁর সাহিত্যে ফরাসি সাহিত্যের আঙ্গিক লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—''বড় বড় ফরাসী লেখকদের গল্প অপেক্ষা তোমার গল্প কোন অংশে হীন নহে।''

প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যিক গি দ্য মোপাসাঁর সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে 'বাংলার মোপাসাঁ' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—''প্রভাত কুমারের গল্পগ্রন্থ যেকোনো মানুষের পক্ষেই চিত্ত-বিনোদনের অতি উৎকৃষ্ট উপকরণ। তাঁর কৌতুকরস আমাদের কাছে নির্মল হাসির উপচার বহন করে আনে, তাঁর কারুণ্য আমাদের হৃদয়ের ওপর কিছুক্ষণের জন্যে নেত্রছত্র মেলে ধরে। তাই তাঁর গল্প বার বার পড়া যায়। তারা আমাদের মনে কখনো দস্যুর মতো প্রবেশ করে না, ভেঙেচুরে একাকার করে দেয় না, আমাদের রক্ত নাড়িতে ঝড় তুলে বিপর্যয় ঘটায় না। প্রভাত কুমারের ছোটগল্প শান্তরসে আশ্রিত।''

একান্ত আবেগ সর্বস্ব শিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প তাই সাধারণ হয়েও কালজয়ী।

৩

১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে 'দেশী ও বিলাতী' গল্পগ্রন্থে স্থান পায়। মোট তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত গল্পটিতে একটি সুডৌল ও কৌতুকপ্রদ কাহিনী আছে। গাজীপুর শহর, মহল্লা গোরাবাজারে রাম অওতার নামক বাইশ বছরের লালাজাতীয় যুবক বাস করে। রাম অওতার কিছুটা ইংরেজী জানলেও পরপর কয়েকবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় একটু শীতল বাতাসের ছোঁয়া পেতে রাম হাতির দাঁতের বোলাযুক্ত একজোড়া খড়ম পায়ে দিয়ে বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ভৃত্য চতুরির এনে দেওয়া চেয়ারে বসে ভাঙ নিয়ে আসার আদেশ দেয়। চতুরি একটা রূপোর গ্লাসে করে গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি এনে দেয়। বেশ অবস্থাপন্ন লোক রাম অওতারের বাড়িটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। বাজার থেকে কিছুটা দূরে বলে স্থানটা বেশ নিরিবিলি। শুধু মাঝেমধ্যে দু একটা এক্কাগাড়ির ঝমঝম শব্দ শোনা যায়। রাস্তার মোড়ে একটা শিরীষ গাছে অজস্র কোমল ফুল ধরেছে। অন্যদিকে মিউনিসিপ্যালিটির একটা লণ্ঠন ক্ষীণ আলো বিতরণ করছে। সিদ্ধি পান

করতে করতে রাম শুনতে পায় অদূরে গুলাব-ছড়িওয়ালা চাঁচা গলায় শব্দ করে গুলাবছড়ি বিক্রি করছে। তাদের বাড়ির সামনে এসে হাঁক দেয়—

'ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ি!
যো খাওয়ে- মজা পাওয়ে;
যো চাখখে- ইয়াদ্ রাখখে;
গুলাব-ছড়ি!'

বাড়ির ভিতর থেকে রাম অওতারের পাঁচ বছরের ভাই মোহনলাল বাইরে এসে গুলাব ছড়ি কিনবার বায়না করে। বিক্রেতার কাছে গুলাব ছড়ি ছাড়াও নানখটাই, সোহন হালুয়া ছিল। কিন্তু মোহনলাল গুলাবছড়িই কেনে। বিক্রেতা একখানা হিন্দি সংবাদপত্রের কিছুটা অংশ ছিঁড়ে তাতে গুলাব ছড়ি মুড়ে দেয়।

কাগজে একটা হাতির ছবি দেখে মোহনলাল তার দাদাকে তা দেখায়। রাম অওতার দেখে একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে একটা বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখতে পায়। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—

'প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

লালা মুরলীধর লাল
মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদারঘাট,
বেনারস সিটি।'

বিজ্ঞাপনটি রাম অওতার দুবার পাঠ করল। বিজ্ঞাপনটি কিছু পুরানো হলেও রাম অওতার সিদ্ধির নেশায় তা বুঝতে পারেনি। তার বাল্যকালে বিয়ে হয়ে গিয়েছে নাহলে এ বিবাহের বিজ্ঞাপনটি তারকাছে বেশ মজাদার এবং লোভনীয়। প্রার্থনা সমাজীয় কন্যাদের রূপ গুণ শিক্ষা সম্পর্কে সে বিশেষ আগ্রহী ছিল। সিদ্ধির নেশা যখন জমে উঠেছে তখন তার মনে হল বিজ্ঞাপন দাতার কাছে তার পূর্ব বিবাহের কথা গোপন করে পুনরায় এই বিবাহের কথাবার্তা শুরু করা যেতে পারে। এভাবে বেশ কিছুদিন পাত্রী ও তার বাড়ির লোকজনের সাথে মেলামেশা করে সুযোগ সুবিধা বুঝে পালিয়ে এলেই হল। এরপর পরবর্তী ঘটনা কতটা মজার হতে চলেছে সেকথা ভেবে হা হা করে হেসে ওঠে।

বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে রাম বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়ে চিঠি লেখে। চিঠির সম্বোধন অংশে 'শ্রী শ্রী গণেশায় নমঃ' লিখলেও প্রার্থনা সমাজীয়রা হিন্দু দেবদেবীদের নাম শুনলে রেগে যেতে পারে ভেবে সম্বোধন পরিবর্তন করে 'শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি' লেখে। রাম অওতার বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র কিছু তামাশা করার জন্য এই বিবাহে ইচ্ছুক হয়। বিজ্ঞাপনে বিবাহের শর্তাবলিতে বিলেত যাবার প্রস্তাবে উৎফুল্ল

প্রকাশ করে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও চিঠিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে বি.এ পরীক্ষায় ফেল লেখে। চিঠির শেষে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত মেয়েটির একটি ফটোগ্রাফ চেয়ে পাঠায়। ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নিজেকে অবিবাহিত ঘোষণা করে কন্যাপক্ষের সাথে তার এই তামাশার কথা ভেবে নিজের হাসি সংবরণ করতে পারে না। এখানেই শেষ হয় প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনা হয় কাশীর কেদারঘাটের কাছে একটা ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকায়। দ্বিপ্রহরে দুই ব্যক্তি বসে দাবা খেলছিল। তারা কাশীর দুজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা মহাদেও মিশ্র ও সাকরেদ কাহ্নাইয়ালাল। রাম অওতারের লেখা চিঠিটি বিবাহের বিজ্ঞাপনে দেওয়া মহাদেও মিশ্রের বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছলে তা ভৃত্য মারফত মহাদেও মিশ্রের হাতে আসে। বিজ্ঞাপনদাতা লালা মুরলিধর লাল মহাদেও মিশ্রের বাড়িতে ভাড়া থাকতো। তবে দু তিন বছর আগে মুরলীধর বেনারস সিটি ছেড়ে লখনৌ বদলী হয়ে গিয়েছে। চিঠির সমাচার কি আছে তা জানার জন্য মহাদেও মিশ্র তার সাকরেদকে তা পাঠ করতে বলে। পত্রের বক্তব্য শুনে মহাদেও হাসতে থাকে। কারণ বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত মুরলীধরের মেয়ের প্রায় তিন বছর আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। উচ্চশিক্ষিত বিলেত ফেরত কায়স্থ পাত্রের সাথেই মেয়ের বিয়ে দেয়। সেই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য রাম অওতার চিঠি পাঠিয়েছে এবং মেয়েটির একটি ফটোগ্রাফ চেয়ে পাঠিয়েছি। কাহ্নাইয়ালাল রাম অওতারকে কাশীতে আসার জন্য চিঠি লিখতে বলে মহাদেও মিশ্রকে। মহাদেও প্রথমে খুব একটা রাজী না হলেও পরে কাহ্নাইয়ালালের কথার যুক্তি ও লাভের কথা শুনে চিঠি লিখতে রাজি হয়। তারা রাম অওতারের টাকা পয়সা লুঠ করার উদ্দেশ্যে মহম্মদ খানের দোকান থেকে আনা পার্সী থিয়েটার দলের একটি মেয়ের ছবিসহ চিঠি পাঠিয়ে তাকে কাশী আসতে লেখে। সেই সাথে স্থির করে পুলিশের ঝামেলা এড়াতে তারা রামকে নিজেদের বাড়িতে না এনে অন্য একটি বাড়িতে তুলবে। অতিথি আপ্যায়নের জন্য এক পোয়া ভাং আর সঙ্গে একটু ধুতরার রস মিশিয়ে দিলেই হবে।

গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাম অওতার অপরাহ্নকালে গোরাবাজারে নিজের বাড়িতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে চিঠির উত্তরের আশায়। তার প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ডাকওয়ালা বেনারস সিটির মোহর আঁটা একটা চিঠি ও একটি প্যাকেট দেয়। রাম প্রথমেই প্যাকেট খুলে সুন্দরী যুবতীর মনোজ্ঞ ছবির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে। পার্সী মহিলাদের ধরণে শাড়িপড়া সুন্দরীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যায় সে। চিঠিতে রামকে শনিবার সন্ধ্যার গাড়িতে কাশী যেতে বলা হয়েছে। তবে কেদারঘাটে তাদের বাড়িতে না এসে ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লিখেছে। পাত্রীর বাড়ির লোক এসে তাকে ষ্টেশন থেকে নিয়ে যাবে। চিঠি পড়া শেষ করে আবার মেয়েটির ছবি দেখলো আর ভাবলো এই মেয়েটির সাথে আলাপ করলে কত মজা হবে। রাম অওতারের প্রতীক্ষার

অবসান যেন হতে চায় না। শনিবারের পরিবর্তে শুক্রবার আসতে লিখলে বুঝি ভালো হতো। বাড়িতে বলল—"একবার কাশীজী দর্শন করে আসি।"

প্রথম দর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয় সঞ্চার করার জন্য নিজেকে মূল্যবান আভরণে সাজালো। ভালো রেশমী চাপকান, জরির কাজকরা সুন্দর মখমলের টুপি, দিল্লি থেকে আনা সুকোমল রঙিন জুতো পড়ে, উৎকৃষ্ট আতর রুমালে গোঁফ ও জুলফে মাখে, সোনার ঘড়ি, সোনার চেন, হীরের আংটি পড়ে ও দুশো টাকা সঙ্গে নেয়। রেলগাড়িতে বসে সুন্দরী তরুণীর সাথে প্রথম সম্ভাষণের খসড়া মনে মনে প্রস্তুত করে। ইংরাজী উপন্যাস না পড়ার কারণে ওদের প্রেম নিবেদনের রীতি রামের জানা ছিল না। তবে 'লাল হীরাকি কথা', 'লয়লা মজনু', 'গুল-ই-বকাওলি' প্রভৃতি তার পড়া ছিল। তাই ঐ বইতে বর্ণিত প্রেম নিবেদনের রীতি অবলম্বন করা শ্রেয় মনে করলো। এই ধরণের মেয়েরা শিক্ষিত ও সভ্যতাপ্রাপ্ত বলে প্রথমে তু না বলে আপ বলা উচিত মনে করে। তবে আলাপ যখন বেশ জমে উঠবে তখন একদিন নির্জনে ডেকে 'পিয়ারী' বলে সম্ভাষণ করবে ঠিক করে।

রাজঘাট ষ্টেশন পৌঁছে রাম উত্তরীয় ও পাঞ্জাবী কামিজ পড়া এক যুবককে তার জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখে। যুবক কিষুনপ্রসাদ ও নিজেকে মুরলীধরের ভাইয়ের ছেলে বলে পরিচয় দেয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় কাশীতে ছোট দোল থাকায় ছেলে মেয়েরা পিচকারি দিয়ে রং দিচ্ছিল। রাম তার দামী পোশাক রঙের হাত থেকে বাঁচতে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে কাঁচ টেনে দেয়। কিষুনপ্রসাদ ওরফে কাহ্নাইয়ালালের সাথে গল্প করতে করতে একটা পাথরে তৈরি অট্টালিকায় পৌঁছায়। বাড়ির ভিতরে ফরাস বিছানায় বসে আলবোলায় ধূমপানরত মহাদেও মিশ্রের সাথে আলাপ হয়। তবে এখন তিনি নিজেকে মুরলীধর বলে আত্মপরিচয় দেন। পরিচয়পর্ব শেষ হলে ভৃত্য কিছু মিষ্টি ও কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি দিয়ে নতুন অতিথির আপ্যায়ন শুরু করে। রাত প্রায় আটটা নাগাদ সিদ্ধির নেশায় রাম অওতারের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। এরপর কাহ্নাইয়ালালের অনুরোধে রাম গান গাইতে আরম্ভ করে—

'বতা দে সখি,কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম।
গোকুল ঢুঁড়ি
বৃন্দ্রাবন ঢুঁ-'

গান সম্পূর্ণ হবার আগেই নেশায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায়। তখন মহাদেও মিশ্রের আদেশে কাহ্নাইয়ালাল রাম অওতারের দেহ থেকে ঘড়ি, চেন, হীরের আংটি, দুশো টাকা, রূপার পানের ডিবা, জুতো, টুপি, রেশমী পোশাক খুলে নিলো। এরপর একটা গেরুয়া কৌপিন পরিয়ে গায়ে ভস্ম মাখিয়ে একটা চিমটা, কয়েকটা খুচরো পয়সা ও ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে মানমন্দিরের দেউড়িতে শুইয়ে দেয়। কয়েকদিন পর গাজীপুরে রটে যায় রাম অওতার সন্ন্যাস নিয়েছে। তার মামা কাশীর রাস্তায় ভিখারী সন্ন্যাসী অবস্থায়

দেখে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে আবার গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়ে এনেছে। তবে ধার্মিক ব্যক্তি বলে তখন থেকে রাম অওতারের খ্যাতি জন্মায়।

৪

নামকরণের মধ্যে দিয়ে সবকিছুকে সুচিহ্নিত করা মানুষের সুপ্রাচীনকালীন অভ্যাস। সাহিত্যের নামকরণ শুধু নামমাত্র নয়, তা গভীর অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সমালোচক বলেছেন- ''নামকে যাহারা নামমাত্র মনে করে আমি তাহাদের দলে নই।'' তাই নামই সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশের প্রধান চাবিকাঠি। বক্তব্য বিষয়ের অর্থবহ ইঙ্গিত নামকরণের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। সাহিত্যে নামকরণ বিভিন্ন ভাবে হয়। নায়ক নায়িকার নাম অনুসারে, কখনো মূল বিষয়বস্তু স্থান কাল অনুসারে, আবার কখনো ব্যঞ্জনাধর্মী। 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পটি কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা একটি বিবাহের বিজ্ঞাপনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে মূল কাহিনী। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাম অওতার একজন লালাজাতীয় যুবক, বয়স বাইশ বছর, বেশ অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় সিদ্ধির নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় সংবাদপত্রে একটি বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে। রাম অওতার বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র কিছু তামাশা করার জন্য বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠি লেখে। তার উদ্দেশ্য মোটেও ভালো ছিল না—''একটা কার্য করা যাউক। উহাদিগকে পত্র লিখিয়া গিয়া দেখা করি। কিছুদিন উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া, মজাটাই দেখা যাউক না কেন! তাহার পর সটকাইলেই হইবে।''

এই উত্তরের ভবিষ্যত কতটা মজার হতে চলেছে এই ভেবে সে হাসি সম্বরণ করতে পারলো না। কাহিনীর সূচনায় এই বিবাহের বিজ্ঞাপন নাটকীয় বাতাবরণ তৈরি করেছে, কাহিনীর মোড় কোনদিকে যেতে চলেছে তার ইঙ্গিত প্রদান করেছে।

রাম অওতারের চিঠি গিয়ে পৌঁছায় বেনারস সিটির মহাদেও মিশ্রের হাতে। এই মহাদেও মিশ্রের বাড়িতে দুতিন বছর আগে লালা মুরলীধর ভাড়া থাকতো। তাই এই ঠিকানা থেকে মুরলীধর তার মেয়ের বিবাহের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। তবে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত মেয়েটির প্রায় তিন বছর আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং মুরলীধর লখনৌ বদলি হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞাপনটি যে বহু পুরোনো তা নেশার ঝোঁকে রাম লক্ষ করেনি। কাশীর দুই প্রসিদ্ধ গুণ্ডা মহাদেও মিশ্র ও সাকরেদ কাহ্নাইয়ালাল চিঠিটি পড়ে হাসতে থাকে। পরে রাম অওতারের সর্বস্ব লুঠ করার উদ্দেশ্যে কাশী আসার জন্য চিঠি লেখে। চিঠির সঙ্গে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত সপ্তদশবর্ষীয়া নারীর একটি নকল ছবি পাঠায়। মহাদেও মিশ্র ও কাহ্নাইয়ালাল আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিল কিভাবে শিকারকে জালে ফাঁসিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নেবে—''এক পোয়া ভাঙ, সঙ্গে একটু ধুতুরার রস - আর কিছুই করিতে হইবে না।''

লালা মুরলীধর লালের ছদ্মনামে লেখা মহাদেও মিশ্রের চিঠি ও সুন্দরী নারীর ছবি দেখে রাম অওতার অস্থির হয়ে ওঠে কাশী যাবার জন্য। চিঠিতে শনিবার যেতে বলা হলে তার মনে হয় শনিবারের পরিবর্তে শুক্রবার আসতে লিখলে বুঝি ভালো

হতো। অবশেষে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কাশীর রাজঘাট ষ্টেশনে পৌঁছায়। সপ্তদশবর্ষীয়া প্রার্থনাসমাজীয় সুন্দরীকে প্রথম দর্শনে প্রেমে আকৃষ্ট করতে সোনার চেন, সোনার ঘড়ি, হীরের আংটি, দামী জুতো, জামা, টুপি পরে এবং সঙ্গে নেয় নগদ দুশো টাকা। বাড়িতে বলে যায় কাশীতে তীর্থ করতে যাচ্ছে।

ষ্টেশন থেকে কাহ্নাইয়ালাল কিষুনপ্রসাদ ছদ্মনামে তাকে গাড়িতে বসিয়ে একটি প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকায় নিয়ে যায়। সেখানে আলাপ হয় মুরলীধরের ছদ্মনামে আলবোলায় ধূমপান রত মহাদেও মিশ্রের সাথে। রাম অওতারের আতিথ্যের পূর্বপরিকল্পনা হয়ে ছিল। ধুতরার রস মিশ্রিত সিদ্ধি পান করে যখন রাম অচৈতন্য প্রায়, তখন মহাদেও মিশ্রের নির্দেশে কাহ্নাইয়ালাল রাম অওতারের টাকা পয়সা সোনাদানা এমনকি পোশাক পরিচ্ছদ লুঠ করে কৌপিন পড়িয়ে সন্ন্যাসী সাজিয়ে মানমন্দিরের দেউড়িতে শুইয়ে দেয়। যাতে তাকে সর্বস্ব হারিয়ে অভুক্ত থাকতে না হয় তাই সঙ্গে একটি চিমটা একটা ঝুলি ও কয়েকটা খুচরো পয়সা দিয়ে সন্ন্যাসীর সাজ বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। বোঝা যায় গুণ্ডা হলেও সামান্য একটু মানবিকতা দেখিয়ে একমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার রাস্তা খোলা রেখেছে। একটি বিবাহের বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে একজন ঠকবাজের ঠকে যাওয়ার কাহিনী এটি। রাম অওতার বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত মেয়েটি ও তার পরিবারের সাথে বিয়ে বিয়ে খেলা খেলতে গিয়ে নিজেই মজার পাত্রে পরিণত হয়েছে। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় এই গল্পে একটি সামাজিক সমস্যাকে লঘু হাস্যরসের মাধ্যমে সহজ সরল ভাষায় পরিবেশন করেছেন। কাউকেই বিশেষ আঘাত না করে হালকা হাসির ভেলা ভাসিয়েছেন। গল্পের শেষে রাম অওতার আবার গৃহস্থাশ্রমে ফিরে এসেছে এবং ধার্মিক মানুষ হিসাবে তার বেশ খ্যাতি ছড়িয়েছে। সুতরাং এই বিবাহের বিজ্ঞাপন মূলকাহিনীর চালিকাশক্তি, গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে নাটকীয় পরিণতি দান করেছে। তাই 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' নামকরণটি সার্থক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

৫

'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পে চরিত্রের ঘনঘটা না থাকলেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আছে যারা মূলকাহিনীকে পরিণতি দান করেছে। এক নজরে চরিত্রগুলি হল—

রাম অওতার—গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ—রাম অওতারের ভৃত্য।

মোহনলাল—রাম অওতারের ভাই।

লালা মুরলীধর লাল—বিবাহের বিজ্ঞাপন দাতা।

মহাদেও মিশ্র—কাশীর প্রসিদ্ধ গুণ্ডা।

কাহ্নাইয়ালাল—মহাদেও মিশ্রের প্রধান সাকরেদ ও আরেক গুণ্ডা।

রাম অওতার : গল্পের কেন্দ্রীয় তথা মুখ্য ভূমিকায় আছে রাম অওতার। বাইশ বছরের বিবাহিত রাম অওতার ইংরেজী কিছু কিছু জানলেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় কয়েকবার ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। স্বচ্ছল পরিবার, আয়েসীও বটে। ভাইকে কিনে

দেওয়া গুলাবছড়ি মোড়ার কাগজটিতে বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি পাঠায়। মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে রাম অওতার পাত্রীর বাড়ি চিঠি পাঠায়। বাল্যকালে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিয়েছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কয়েকবার ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও চিঠিতে বি.এ.পরীক্ষায় ফেল এবং পাত্রীর বাড়ির শর্তে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বিলেত যেতে সম্মত হয়েছে। রাম অওতার যেমন মিথ্যে আশ্রয়কারী তেমনি কর্তব্যজ্ঞানশূন্য। ঘরে বিবাহিত স্ত্রীকে মিথ্যে বলে আর একটা বিয়ের ব্যবস্থা এবং কিছুদিন পরে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পরিকল্পনা রাম অওতারের চরিত্রকে কিছুটা বিপরীতমুখী করেছে। বিবাহ নামক মধুর সম্পর্কের এক হাস্যকর করুণ পরিণতি দিতে চেয়েছে। এই মিথ্যার জন্য সে অনুতপ্ত নয় বরং তার কাছে এটা একটা তামাশামাত্র—''ভবিষ্যত ঘটনা সম্বন্ধে যতই সে কল্পনা করে, ততই তাহার হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া ওঠে।''অপরকে পর্যুদস্ত করে আনন্দ পায় যে ব্যক্তি তাকে কখনই সৎ ও মহৎ বলা যায় না।

রাম অওতারের মধ্যে যথোচিত ধৈর্যের অভাব আছে। মহাদেও মিশ্রের পাঠানো পাত্রীর নকল ছবি দেখেই সে অস্থির হয়ে উঠেছে। শনিবারের জায়গায় শুক্রবার যেতে লিখলে সে বেশি খুশি হত—''লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতে। সে আর দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন?''

রাম অওতার ফন্দিবাজ ও চটকদারও বটে। পাত্রীর যাতে প্রথম দর্শনেই তাকে পছন্দ হয় তাই সযত্নে পরিধান করেছে। জরির কাজ করা সুন্দর মখমলের টুপি, রেশমী চাপকান, দিল্লি থেকে আনা রঙীন জুতো, হিরের আংটি, সোনার চেন, সোনার ঘড়িতে নিজেকে সাজিয়েছে। বিবাহে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খরচপত্রের জন্য সঙ্গে নেয় দুশো টাকা।

রাম অওতার রসিক ব্যক্তি। প্রার্থনাসমাজীয় নারীরা শিক্ষিতা ও রুচিশীলা বলে পাত্রীকে প্রথম সম্বোধনে 'তু' না বলে 'আপ' বলা উচিত মনে করে। তবে দু চারদিন যাতায়াতের পর নির্জনে 'পিয়ারী' বলে সম্ভাষণ করে তার মন জয় করতে চায়। এছাড়া কাশীতে সিদ্ধি খাবার পর কানহাইয়ালালের অনুরোধে গান গেয়েছে—

'বতা দে সখি,কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম।
গোকুল ঢুঁড়ে
বৃন্দ্রাবন ঢুঁ-'

বাড়িতে মিথ্যে বলে কাশীজী দর্শনের নাম করে দ্বিতীয়বারের নকল কোর্টশিপ বিয়ে করতে গেছে। শেষ পর্যন্ত অপরকে ঠকাতে গিয়ে নিজে দুই গুণ্ডার দ্বারা সর্বস্বান্ত হয়ে কাশীর মানমন্দিরের দেউড়িতে সন্ন্যাসীর পোশাকে পড়ে থেকেছে। আসলে হালকা মজার ছলে পাত্রী পক্ষের সাথে যে তামাশা রাম অওতার করতে চেয়েছিল তা বুমেরাং হয়ে তার নিজের দিকে ফিরে এসেছে। এই চরিত্রটিই গল্পের মূল আকর্ষণ। অন্যকে

ঠকাতে গিয়ে নিজেই কিভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছে, রাম অওতার [illegible] লেখক তা-ই তুলে ধরেছেন গল্পে।

মহাদেও মিশ্র : মহাদেও মিশ্র কাশীর এক প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছুটা স্থূল, গৌরবর্ণ। তার বাড়িতে দুতিন বছর আগে থাকত মুরলীধর লাল। এই মুরলীধর লাল তার মেয়ের বিয়ের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। মুরলীধর অনেকদিন আগেই লখনৌ বদলি হয়ে গিয়েছে। তাই রাম অওতারের চিঠি এসে পৌঁছায় মহাদেও মিশ্রের বাড়িতে। মুরলিধরের নামে আসা চিঠি মহাদেও খুলে পড়ে [illegible] যায় মহাদেও মিশ্র চরিত্রটিকে।

এরপর কাহ্নাইয়ালাল রাম অওতারকে কাশীতে ডেকে এনে সর্বস্ব লুণ্ঠনের পরিকল্পনা করলে মহাদেও প্রথমে রাজি হয়নি—"উহার কাছে আর কি মিলিবে? দুই চার দশ টাকা মিলিবে কিনা সন্দেহ।"

তবে নকল ফটোগ্রাফ পাঠানো ও ধুতরার রস মিশ্রিত সিদ্ধিপান করিয়ে সর্বস্ব লুণ্ঠনের পরবর্তী পরিকল্পনা তারই ছিল।

মহাদেও মিশ্র গুণ্ডা হলেও বেশ বিবেচক ব্যক্তি। তাই [illegible] নিজেদের বাড়ির বদলে অন্য এক ঠিকানায় রাম অওতারকে আনতে বলেছে। এছাড়া নেশায় অচৈতন্য রাম অওতারের সর্বস্ব লুঠ করে সন্ন্যাসীর পোশাক পরিয়ে বলেছে—"উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে যখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপিন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে। একটা চিমটা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসিবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"

গুণ্ডামি, লুঠ মহাদেও মিশ্রের পেশা। কিন্তু লুঠ করলেও মানুষকে হত্যা করেনা। তার মধ্যে সামান্য মানবিকতা ছিল। তাই রাম অওতার যাতে একমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে তার উপায় করে দিয়েছে। ইচ্ছে করলে রামকে লুঠ করে ফেলে পালিয়ে যেতেই পারতো। কিন্তু তা না করে পরবর্তী সময়ে রামের অন্নসংস্থানের কথা চিন্তা করে সমাধানের পথ ঠিক করে দিয়েছে। তাই লোভী গুণ্ডার আড়ালে চরিত্রটির মানবিকতা-গুণকেও অস্বীকার করা যায় না।

কাহ্নাইয়ালাল : কাশীর আর এক নামকরা গুণ্ডা ও মহাদেও মিশ্রের প্রিয় সাকরেদ কাহ্নাইয়ালাল। দেহ ক্ষীণ হলেও শারীরিক বলের পরিচয় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ফুটে ওঠে। রাম অওতারের পাঠানো চিঠি পাঠ করে মহাদেও মিশ্রকে সে শুনিয়েছিল। রাম অওতারকে কাশীতে ডেকে এনে সর্বস্ব লুণ্ঠনের পরিকল্পনা তার ছিল—"সে যখন সাদি করিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোনার ঘড়ি চেন আংটি লাগাইয়া আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইয়া আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি।"

কাহ্নাইয়ালাল বেশ অভিনয় পটু। রাজঘাট ষ্টেশন থেকে মুরলীধরের ভাইপো কিষুনপ্রসাদের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করে রাম অওতারকে নিয়ে আসে। গল্পের শেষে

মহাদেও মিশ্রের কথামতো রাম অওতারের সুন্দর বেশবাস খুলে সন্ন্যাসী সাজিয়ে রামমন্দিরের সিঁড়িতে শুইয়ে আসার দায়িত্ব সে পালন করে। শুধু তাই নয়, সে প্রভুভক্ত। তাই নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য রাম অওতারকে খুঁজে পেয়েও প্রভুর আদেশে রামকে অন্তত ভিক্ষা করে খেয়ে বেঁচে থাকার উপায় করে দিয়েছে।

অন্যান্য চরিত্র : এছাড়া গল্পে মুরলীধর চরিত্রটি প্রত্যক্ষভাবে না এলেও পরোক্ষ আলোচনায় এসেছে। তার মেয়ের জন্য দেওয়া বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে রাম বিয়ের তামাশা করতে আগ্রহী হয়। কাশীতে মুরলীধরের অনুপস্থিতির কারণে রামের পাঠানো চিঠি মহাদেও মিশ্রের হাতে পড়ে এবং গল্পে নাটকীয় মোড় আসে। তাই পরোক্ষ ভাবে থেকেও মুরলীধর এই গল্পে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

এই গল্পে রাম অওতারের চাকর চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ রামকে সন্ধ্যাকালে সিদ্ধি দিয়ে যায়। এই সিদ্ধি পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে বিবাহের বিজ্ঞাপন পড়ে। তাই বিজ্ঞাপনটি কত দিনের পুরানো তা খেয়াল করে না।

রাম অওতারের পাঁচ বছরের ভাই মোহনলাল গুলাব ছড়ি কিনবার বায়না ধরেছিল। বিক্রেতা বিবাহের বিজ্ঞাপন দেওয়া কাগজটিতে মুড়ে গুলাব ছড়ি দিয়েছিল। মোহনলাল সেই কাগজে হাতির ছবি দেখে দাদাকে দেখাতে যায়। রাম সেই কাগজের অপর প্রান্তে বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে। তাই ভাই মোহনলাল এবং গুলাব ছড়ি বিক্রেতা উভয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে বলা যায়, গল্পটি কৌতুকরসাশ্রিত ও মিঠিমধুর। এ ধরনের গল্প কাউকে আঘাত না করে নির্মল আনন্দ দান করে। রাম অওতারকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে যেন ইটের বদলে পাটকেল মারা হয়েছে। রাম অওতারের মতো লোকেরা শুধুমাত্র কিছু তামাশা করার জন্য কত মেয়ের জীবন নষ্ট করে। বিবাহের নামে লোক ঠকানো এদের কাছে মজার ব্যাপার। এই মানসিকতার পরিবর্তন অবশ্যই দরকার। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মাধ্যমে এই বিরূপ মানসিকতা পরিবর্তনের বার্তা দিয়েছেন।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত কথা, ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য, বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি., ১৯৬৬

২. বাংলা গল্প বিচিত্রা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, মাঘ ১৪০১

৩. প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বাছাই গল্প, সম্পাদনা প্রফুল্ল কুমার পাত্র, পাত্রজ পাবলিকেশন, ১৯৬০

মনোজ মণ্ডল ও শ্রেয়া মণ্ডল সম্পাদিত 'বিশ্লেষণের আলোকে বাংলা ছোটগল্প' গ্রন্থটি বাংলা সমালোচনার জগতে বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কারণে। প্রথমত, ১৬ জন গল্পকারের ৩২টি গল্প গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে। গল্পগুলির এতো বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থের অনেকগুলি গল্প এই প্রথম আলোচিত হয়েছে। তৃতীয়ত, গল্পগুলি NET / SET এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। তাই NET / SET ও অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের বিশেষভাবে প্রয়োজন সিদ্ধ করবে।

Rs. 450/-

9 789386 028549

বাংলা উপন্যাসে
দেশভাগ
ও উদ্‌বাস্তু জীবনবোধ

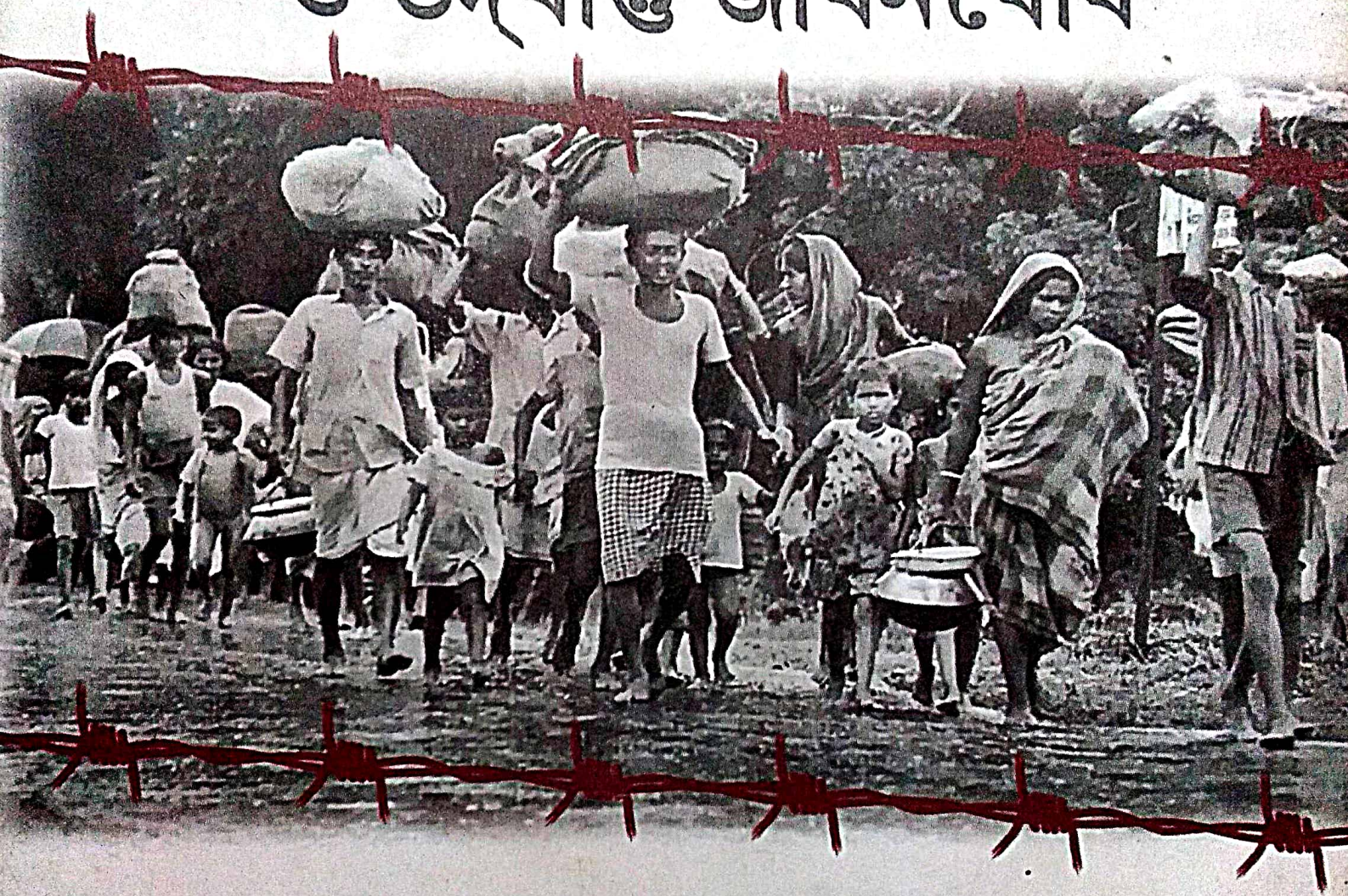

সম্পাদনা

ড. সুব্রত কুমার দে

Bangla Upanyase Deshbhag O Udwastu Jeebanbodh
Edited by Dr. Subrata Kumar De
Published by Dr. Jhuma Roychowdhury
Anjali Prokashani,
'Vidyasagar Tower', Shop No. 16 (1st Floor)
15, Shyamacharan Dey Street, Kolkata-700 073

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২১
প্রচ্ছদ : কৌশিক দত্ত
© : ড. সুব্রত কুমার দে
ISBN : 978-81-943963-4-5

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকাশক :
ড. ঝুমা রায়চৌধুরী, অঞ্জলি প্রকাশনী
'বিদ্যাসাগর টাওয়ার' ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, শপ-১৬ (দোতলা)
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
Phone : 9836258380 / 8240527449
Web : www.anjaliprokashani.com
Email : anjaliprokashani@hotmail.com

মুদ্রক :
অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৪

মূল্য ঃ ৬০০.০০

- জীবনানন্দের 'জলপাইহাটি' : দেশভাগের যন্ত্রণার আলেখ্য
  মাধবী বিশ্বাস ১৪৭
- অথ স্ত্রী-পর্ব
  কৌশিক দাশগুপ্ত ১৫৭
- দেশভাগের স্মৃতি ও আত্মজীবনীর কথালাপ :
  তারাপদ রায়ের 'চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি'
  দীপঙ্কর ঘোষ ১৬৫
- মানুষের জীবন থেকে জীবন-বিয়োগের আখ্যান :
  'বিয়োগপর্ব' উপন্যাস
  ফরিদা ইয়াসমিন ১৭৫
- নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প' :
  দেশভাগ ও ক্যাম্প জীবনে উদ্‌বাস্তুদের সমস্যা
  মামণি মণ্ডল ১৮৫
- নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক' : ছিন্নমূল মানুষের ইতিকথা
  সুমনা ঘোষ ১৯৩
- প্রতিভা বসুর 'সমুদ্র হৃদয়' ও 'আলো আমার আলো' : প্রসঙ্গ দেশভাগ
  সহিনূর খাতুন ২০২
- জন্মভূমিচ্যুতি থেকে পুনর্বাসন সন্ধানের আবহে প্রেমসত্তার নির্মাণ :
  প্রফুল্ল রায়ের 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা'
  আস্তাইন বিল্লা ২১২
- প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকো' :
  ভাসমান ছিন্নমূল মানুষের জীবনসংগ্রাম
  ঝুমা নস্কর ভাণ্ডারী ২২০
- প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি' : উদ্‌বাস্তু মানুষের জীবনসংগ্রাম
  দেবজিৎ সিনহা ২২৮

প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' : ভাসমান ছিন্নমূল মানুষের জীবনসংগ্রাম

ঝুমা নস্কর ভাণ্ডারী

সারসংক্ষেপ

কালের প্রবাহে ভাসমান জীবনতরী প্রতিকূলতাকে জয় করে নিশ্চিন্ত নীড়ের সন্ধান করে। কিন্তু ধর্ম, সংকীর্ণতা, ভেদাভেদের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে তারাই হয় ছিন্নমূল, নোঙরহীন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার বার্তা কিছু মানুষের মুক্তির স্বাদ, আবার অনেকের শেকড় ছেঁড়ার ইতিহাস। কারণ স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধির মধ্যে নিহিত ছিল দেশভাগের নির্মম বেদনা। শত শহীদের প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা উদ্‌যাপিত হল শতসহস্র স্বজনহারা, নীড়ভাঙ্গা মানুষের চোখের জলে। ধর্ম, সম্ভ্রম, প্রান বাঁচাতে রাতারাতি ভিটেমাটি ছাড়া মানুষগুলোর ঠিকানা হল উদ্‌বাস্তু ক্যাম্প-কলোনি, মহানগরের ফুটপাত অথবা মনুষ্যবসতিহীন জঙ্গলময় স্থান। রাজদিয়ার মতো পূর্ববঙ্গের অসংখ্য গ্রামীণ ছিন্নমূল মানুষ দেশভাগের যন্ত্রনা বুকে নিয়ে কেয়াপাতার নৌকায় ভেসে শুরু করেছিল যে জীবনসংগ্রাম তা শতধারায় বয়ে চলেছে। এই অপরাজেয় মানুষের উত্তাল সময়ের অনন্য সংগ্রাম ও রক্তক্ষরা ট্র্যাজেডিই প্রবহমান জীবনের চরমসত্য ও জীবন্ত ।

সূচক শব্দ : ছিন্নমূল - ভাসমান জীবন - জীবনসংগ্রাম - উত্তাল সময় - সাম্প্রদায়িকতা - নোঙর।

মূল প্রবন্ধ

জীবনসমুদ্রের উজানস্রোতে ভেসে চলা মানবতরী উত্তাল ঢেউ-এর সাথে সংগ্রাম করে ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে ফেলে নোঙর। এই নোঙর ফেলা মানুষগুলি নীড়ের সন্ধান করে। কিন্তু ধর্ম, রাজনীতি, ভেদাভেদ, সংকীর্ণতার নাগপাশে জড়িয়ে তারাই হয়ে যায় আশ্রয়হীন, ছিন্নমূল। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা দীর্ঘদিনের পরাধীনতার

শৃঙ্খল মোচন করে এনেছিল মুক্তির স্বাদ। কিন্তু সমুদ্রমন্থন-এর অমৃতের সাথে গরলরূপী দেশভাগ জাতীয় জীবনে এক ট্র্যাজিক ক্ষত সৃষ্টি করে। 'মোরা একটি বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান'— কবির এই বাণী যেন সেদিন ধর্ম ও রাজনীতির যাঁতাকলে পেষণ হচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের গোড়ায় গলদটা অনেক আগেই বুঝেছিল। তাই হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকেই নিজেদের হাতিয়ার করেছিল। ইংরেজ সরকারের অপরিণামদর্শিতায় রুটির টুকরো নিয়ে হিংসার প্রবল প্রকাশ, যার নাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আসলে তা গণহত্যা। ভারতবাসীর এই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ফল দ্বিজাতিতত্ত্ব, যার নেতিবাচক অবয়ব দেশভাগ—"গণ আন্দোলনের বদলে গণহত্যা, কলকাতার নরক, মারীর বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নেতাদের কচকচানি হিসেব নিকেশের অন্ত নেই। এদিকে বহু নরনারী শিশু স্বর্গালোকে চলে গেল 'স্বাধীনতা'র হত্যাকাণ্ডে।"[১] দেশভাগ তো শুধু সিরিল র‍্যাডক্লিফের তৈরি এক সীমারেখামাত্র নয়, ছিন্নমূল মানুষের মনেরও এক দ্বিধাদীর্ণ বিভাজন। শতশহীদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেলাম তা উদ্‌যাপিত হল শতসহস্র স্বজনহারা, নীড়ভাঙা, মানুষের চোখের জলে। হিংসার রাজনীতিতে দেশ রক্তের জোয়ারে ভেসেছে, ভিজেছে মাটি। মৃত্যুভয়তাড়িত ছিন্নমূল মানুষের দীর্ঘ, অন্তহীন ভাসমান হিমবাহ স্রোত দেখেও রাজনীতিকদের চোখের পাতা কাঁপেনি। ছিন্নখঞ্জনার মতো এই আশ্রয়হীন মানুষগুলোর করুণ অসহায়ত্ব, ভাসমান জীবনের গভীর বিষাদ, টিকে থাকার সংগ্রাম শুধু ইতিহাস হয়ে রইল।

সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য গতিময় সময়কে আপনদেহে স্থাপনের মাধ্যমে বাস্তবনিষ্ঠ ও অমূল্য হওয়া। এপার বাংলা, ওপার বাংলার বহু সাহিত্যিক তাঁদের লেখনীতে দেশভাগের রক্তাক্ত ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলেছেন। দেশভাগের কথা বলতে গিয়ে খুশবন্ত সিং-এর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'A Train To Pakistan', কান্তি পাকড়াশির 'The Uprooted', আনাম জ্যাকারিকার 'ফুটপ্রিন্ট অব পার্টিশানস'-এর উদ্‌বাস্তু মানুষের অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে। দেশবিভাজনে উদ্‌বাস্তু মহিলাদের লাঞ্ছনা, নির্যাতনের বাস্তব দলিল বুটালিয়ার 'The Other Side Of Silence', নীলিমা দত্তের 'উজান স্রোত', রিতু মেনন আর কমলা ভাসিনরার 'Borders And Boundaries' ইত্যাদি বইগুলিতে। এছাড়া দেশভাগের আগুনে দগ্ধ মানুষের আপন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বহু কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক দলিল। কখনো জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-'৪৭' কবিতায়, কখনো সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', আব্দুস সামাদের 'দো গজ জমিন'-এর মতো বহু রচনায় এই উদ্‌বাস্তু মানুষের লোনা জলের স্বাদ মেলে। এমনি ছিন্নমূল ভাসমান উদ্‌বাস্তু জীবনসংগ্রাম কেন্দ্রিক উপন্যাস প্রফুল্ল রায় এর 'কেয়াপাতার নৌকো'।

অবিভক্ত পূর্ববাংলার জল, মাটি মেখে বড় হয়েছেন ঔপন্যাসিক। সোনার বাংলার ধানক্ষেত, পদ্ম-শালুকবন, হাঁসের ডানার মতো ভেসে চলা নৌকা, নোনাজল আর মিঠে মাটির স্বাদ তাঁর রক্তে। ঔপন্যাসিকের মাতৃভূমির প্রতিরূপ চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু রাজদিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকার বর্ণনায়। উপন্যাসের সূচনাকাল ১৯৪০, কলকাতাবাসি অবনীমোহন তাঁর পরিবারকে নিয়ে পূজার ছুটিতে রাজদিয়া বেড়াতে এসে এই মাটির টানে স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। বিদেশি লারমার সাহেব এই মাটির টানে লারমার থেকে হন লালমোহন। এই রাজদিয়া জানে মানুষকে ভালোবাসতে, আশ্রয় দিতে। এই রাজদিয়ার অভিভাবক হেমবাবু, যিনি রাজদিয়া ও তার আশেপাশের বহু গ্রামের ত্রাতা। ঔপন্যাসিক সহজ সারল্যে অবনীমোহন ও সুরমা দেবীর সন্তান বিনু ওরফে বিনয় কুমার বসুর চোখ দিয়ে এই আখ্যানটি দেখিয়েছেন। বিনুদের আতিথ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোটা রাজদিয়া। হাসিতে খুশিতে ভরে যায় বিনুদের গ্রাম্যজীবন। যুগলের সাহচর্য, ঝিনুকের মিষ্টিমধুর হিংসুটেপনা, দিদিদের সাথে খুনসুটি, ঝুমার চপলতা, হেমনাথবাবুর উদারতা-মহত্ব, স্নেহলতা দেবির স্নেহের আতিথ্যে, লারমার দাদুর গরিব মানুষের সেবা, মজিত মিঞার মিঠেকড়া শাসন সবকিছু নিয়ে এক সুখের স্মৃতিপট তৈরি হয়েছিল।

সময় জলের স্রোতের মতো বয়ে যায়। রাজদিয়ার শান্ত, স্নিগ্ধ জীবনে পৌঁছে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বারতা। অবনীমোহন কলকাতা থেকে নিয়ে এলো যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর—

"সন্ধের পর কলকাতার সব আলো নিবিয়ে সাইরেন বাজানো হয়। শকুনের কান্নার মতো কাঁপা কাঁপা একটানা সুর। তখন রাস্তায় কেউ থাকতে পারেনা। হয় কাছাকাছি কোনও বাড়ির ভেতর ঢুকে যেতে হবে। নইলে পার্ক টার্কের ট্রেঞ্চে গিয়ে লুকোতে হবে। তা না হলে এ-আর-পির লোকেরা ধরে নিয়ে যাবে। এক ঘণ্টা কি দু-ঘণ্টা বাদে অলক্লিয়ার সাউন্ড বাজলে আবার বাইরে বেরুনা চলবে।"[২]

এই আগুন যে কতটা ভয়ানকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা জানা যায় রেঙ্গুন থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসা ত্রৈলোক্য সেনের বর্ণনায় । প্রভূত সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও জাপানি বোমার ভয়ে মগ ঠ্যাঙারেদের হাত থেকে প্রান

বাঁচিয়ে সর্বহারা হয়ে ফিরে এসেছে। ত্রৈলোক্যবাবুর মুখে রেঙ্গুন ফেরত উদ্‌বাস্তুদের চরম হেনস্তার বর্ণনা পাওয়া যায়—

"সে যে কী কষ্ট, বলে বোঝাতে পারবনা বউঠাকরুণ। পাহাড় পর্বত বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে দিনের পর দিন হাঁটছি তো হাঁটছিই। হাঁটতে হাঁটতে পা ফুলে গেল। কত লোক যে রাস্তায় পড়ে মরছে, তার হিসেব নেই। খাদ্য নেই, জল নেই। খিদের জ্বালায় পেট পুড়ে গেছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেছে। কোথাও ঝরনা দেখে হয়তো ছুটে গেছি। কাছে যেতেই চোখে পড়ছে দা হাতে মগেরা দাঁড়িয়ে আছে।"[৩]

এই যুদ্ধের ঢেউ রেঙ্গুন, কলকাতা ছাড়িয়ে রাজদিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাম্য শান্ত জীবনে আসে চাঞ্চল্য। সৈন্য ঘাঁটি তৈরির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট,নদী, স্টিমার, বাজারদর, মানুষ সবার মধ্যে পরিবর্তনের স্পর্শ। বাজার থেকে ধান, চিনি, কেরোসিন, কাপড় উধাও হল। সৃষ্টি হল কালোবাজারি, মজুতদার, কন্ট্রোলারদের রমরমা;

"'৪২ শে'র মাঝামাঝি থেকে '৪৫ এর শেষ পর্যন্ত, এই যে আড়াইবছর যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ কৃষকদের জীবনে যে দুর্যোগ নিয়ে এল, যে তোলপাড় ঘটাল—তা তো আমরা আগে কখনও দেখিনি। এই যুদ্ধের জঠরে জন্ম নিল এক নতুনশ্রেণি—মজুতদার। কালোবাজারি শব্দটাও বোধহয় এই প্রথম যোগ হল বাংলা অভিধানে। গ্রামের চাষী লক্ষ্য করল তাদের খাদ্য গিয়ে জমা হচ্ছে মজুতদারের গুদামে—আর তারা দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছে।"[৪]

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দেশ স্বাধীন হল। মুসলিমলীগের সাফল্যের আতসবাজিতে আলো হল পূর্ববাংলা। ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে জন্ম নিল পাকিস্তান, সবুজ তারার পতাকা আকাশ ছুঁয়ে গেল। এরই মধ্যে একদিন সুজনগঞ্জের হাটে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হল। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে বিদেশি আখ্যা নিয়ে দাঙ্গাবাজদের হাতে মারা গেলেন লারমার সাহেব। বাংলার মানুষকে ভালোবেসে তাদের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী চোখের জল আর অভিমান নিয়ে চলে গেল। সুধা সুনীতির বিয়ে, সুরমার মৃত্যু, যুগলের শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়া, অবনীমোহনের আসাম যাত্রা প্রাণশূন্য করল রাজদিয়া তথা বিনুর জীবন। এই স্বাধীনতার হাত ধরে এল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ,রক্তপাত। স্কুলের মাস্টারমশাই মোতাহার সাহেব তাই আক্ষেপ করে বলেছেন,

"দেশভাগই যদি মেনে নেওয়া হল, আগে মানলেই হত। এত রক্তারক্তি, এত

দাঙ্গা, এত হত্যা, ধর্ষণ, আগুন কোনওটাই ঘটত না ।"[৫]

ঘরবাড়ি, মাঠের ধান সব আগুনে পুড়িয়ে দিল। যুবতী মেয়েদের নিয়ে গেল গুপ্তঘাতকে। ঝিনুক আর তার বাবা দাঙ্গার শিকার হয়। ভবতোষ ঘাতকের হাতে প্রাণ হারায়। ঝিনুকের উপর পাশবিক অত্যাচার করে দাঙ্গাবাজেরা। হেমনাথ পুলিশের সাহায্যে ঢাকা থেকে উদ্ধার করে আনে ঝিনুককে—

"কিন্তু এ কোন ঝিনুক? চুল আলুথালু, চোখের দৃষ্টি স্থির, উদ্‌ভ্রান্ত। গালে ঠোঁটে হাতে সমস্ত শরীরে কত জায়গায় যে মাংস উঠে উঠে রক্তারক্তি হয়ে আছে। পরনের জামাটা, শাড়িটা নানা জায়গায় ছেঁড়া। কোনও রাক্ষস যেন তার শরীরের সার শুষে নিয়েছে।"[৬]

বাংলার হাজার ঝিনুকরা সেদিন ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। প্রাণের ভয়ে পূর্ববাংলা ছেড়ে মানুষ ভারতমুখি হল কেয়াপাতার নৌকোয় ভেসে। হেমনাথবাবু নিজের ভিটেমাটি ছাড়তে রাজি না হলেও বিনু ও ঝিনুককে কলকাতা পাঠালেন ।

রাজেক আর তমিজের নৌকায় চেপে বিনু ঝিনুক এক অন্তহীন অনিশ্চিত ভাসমান জীবনসংগ্রাম শুরু করে। জলপথে রাতের অন্ধকারেও তারা গুপ্ত ঘাতকের হাতে পড়ে। তাদের হাতেই নৌকা সুদ্ধ সমস্ত জিনিসপত্র হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে শুধু প্রানে বেঁচে থাকে। তবে মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখে তারা—

"প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটলেও, আজ এই প্রথম বিনু জানল, মৃত্যুভয় কাকে বলে। বেতঝোপের আড়াল থেকে প্রায় সামনাসামনি ঘাতকদের দেখে তার সারা গা বেয়ে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছিলই, হৃদপিণ্ড থেকে শুরু করে হাত-পা, স্নায়ু, চিন্তা করার শক্তি, সমস্ত কিছু অসাড় হয়ে যাচ্ছিল।"[৭]

রাজদিয়া থেকে স্টিমার ঘাট পর্যন্ত বিনুরা আরও অনেক দাঙ্গাবাজ ঘাতকের হাতে পড়েছে। তবে আফজল হোসেন, নাসের আলির মতো মানুষেরা ভগবানের দূত হয়ে তাদের বুকে আগলে স্টিমারে তুলে দিয়েছে। এদের দেখে বোঝা যায় সব মানুষের মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়নি। বৃদ্ধ রামরতন মাস্টারমশাই সরকারী চাকরির প্রলোভন ত্যাগ করে গ্রামের নিরক্ষর মানুষগুলোর কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। আজ বৃদ্ধ বয়সে পরিবার নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তাই আক্ষেপ করে বলেন—

"এম.এ পাশ করার পর সিদ্ধান্ত নিছিলাম, নেশান বিল্ডিং-এর কামে লাগুম। গ্রামে গিয়া জ্ঞানের আলো বিতরণ করুম। আইডিয়ালিয়াজিমের দানব কান্ধে চাপছিল। স্বপ্ন দেখতাম আমার হাত দিয়া হাজার হাজার ছাত্র বাহির হইব। তারা

মাইয়ারে নমনম ভিক দিয়া আগাইয়া নিয়া যাইব। ... কী নেশান বিশু করাছি একবার ভাবো। ভুমিভরা ভিটামাটি থুইয়া মাথার উপুর দুই আনম্যারেড যুবতী মাইয়া আর এক বিধবা মাইয়া লইয়া চইলা যাইতে আছি। শিক্ষাব্রতী হইয়া কী লাভটা হইল। স্বার্থপর হওয়া উচিত ছিল আমার। বৃদ্ধ বয়সে পথের ভিখারি হইয়া গেলাম।"

মাস্টারমশাই স্টিমারেই মারা যান। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে বাংলার সন্তান। তাই তাঁর মৃত শরীরটি ভারতে পৌঁছলেও আত্মা রয়ে গেল পূর্ববঙ্গে, তাঁর স্বপ্নভূমিতে।

হাজার হাজার শিক্ষাব্রতী সংগ্রামী মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে সেদিন শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। সারাদিন একটা স্টিমার আর হাজার হাজার তৃষ্ণার্ত মানুষ। দুচোখে বাঁচার আশা। নতুন নীড়ের স্বপ্ন নিয়ে ছিন্নমূল নতুন ভূমিতে পৌঁছায়। কিন্তু সেখানেও তারা মাথা গোঁজার এক ছটাক ভূমি পায় না। সেই সঙ্গে আছে নারী অপহরণ। পতিতপাবন তার মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে বুকফাটা আর্তনাদ করছে—

"এই মাইয়াটির সোম্মান বাঁচানের লেইগ্যা পাকিস্থান ছাইড়া ইন্ডিয়ায় আসলাম। কিন্তু এইহানেও শকুনের পাল ওরে ছিড়া খাওনের লেইগ্যা জিভা মেইলা রইছে।"

সেদিন হাজার হাজার অসহায় পিতার হাহাকারেও থেমে থাকেনি এই স্বার্থপর রাজনীতি। উদ্বাস্তুদের রাখা ক্যাম্পগুলো ছিল নরকতুল্য। তার পরিচয় পাই আর এক ছিন্নমূল মানুষ হরিচন্দ-এর বেদনায়—

"এ জায়গাটা একেবারে নরক। শয়ে শয়ে মানুষ, চাইরটা মোটে পায়খানা ... ইস্টিশানে ছয় সাত হাত জাগার মইধ্যে আমাগো পাচজন মাইনষের শোওন বসন। কী যে করুম, কপালে কী যে লিখা আছে। ভাইবা দিশা পাইনা। হের উপুর শয়তানের গুষ্টি যুবতী মাইয়াগো ভাগাইয়া লইয়া যাইতে আছে। ডার পাই, আমার মাইয়াটার উপুর শকুনের দৃষ্টি আইসা পড়ছে।"

একদিন যাদের গোয়াল ভর্তি গরু, মাঠ ভর্তি সোনার ফসল ছিল আজ তারা উদ্বাস্তু। শুধু বঞ্চনা আর বিষণ্ণ হাহাকার ছাড়া তারা কিছুই পেল না। এ বিষয়ে সমর সেন বলেছেন—

"পূর্বপাকিস্থান থেকে অনেক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এখানে এসেছেন। কেন্দ্রিয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য এমন কিছুই করেননি ... বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বীভৎস নরমেধ চলে, লক্ষ লক্ষ লোক আদিবাস ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন, নতুন জায়গায় গিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে

বিরল .... আসলে পশ্চিমবঙ্গের অনেকের মনোবৃত্তি উন্নাসিক, উদ্‌বাস্তুরা সরকারি বেসরকারিভাবে যথেষ্ট সহানুভূতি পাননি ।"[১১]

ভাসতে ভাসতে বিনুরা কলকাতায় আসে। বড়দির বাড়ি আশ্রয় পেলেও সম্মান পায়না ঝিনুক। ঝিনুকের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য যে ঝিনুক কোনোভাবে দায়ী নয় তা নিরক্ষর যুগল বুঝলেও কলকাতার ধনী গৃহিণী সুনীতির শাশুড়ি বুঝল না। তাই ঝিনুকের স্থান হল নিচের তলায় বাড়ির কাজের মেয়ের ঘরে। আসলে বাংলাদেশের হাজার হাজার ধর্ষিতা ঝিনুক এভাবেই লাঞ্ছিত হয়। সভ্য সমাজ তাদের কাছে ডেকে নেয়না। তারা ব্রাত্য,অবহেলিত। গুপ্ত ঘাতক তাদের শারীরিক নির্যাতন করেছিল আর এই সভ্য সমাজ তাদের মানসিক নির্যাতন করে পঙ্গু করে দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশভাগের মধ্যেও নিজের স্থায়ী আশ্রয় খুঁজে নেয় নিত্য দাসের মতো লোকেরা। পূর্ববঙ্গে থাকতে কন্ট্রোল আর মদের দোকান করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিল। ভাসমান হয়ে এদেশে এসে ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে দুই বাংলার মধ্যে জমিজায়গা এক্সচেঞ্জ-এর দালালি শুরু করেছে।

উপন্যাসের সমাপ্তি অংশে নিরক্ষর যুগল যেন ছিন্নমূল মানুষের সেনাপতি হয়ে জীবনসংগ্রামে এগিয়ে চলেছে। বিনুকে করেছে এদের কাণ্ডারি। যুগল শেয়ালদা স্টেশানে গিয়ে পরিচিতি উদ্‌বাস্তুদের খোঁজ করে। পেলে তাদের নিয়ে মুকুন্দপুরের বাসিন্দা করে। এক আশ্রয়হীন আর এক আশ্রয়হীনকে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। বিনু পলকহীন হয়ে যুগলকে দেখেছে—

"রাজদিয়ার যে নিরক্ষর যুবকটি হেমনাথের বাড়িতে কামলা খাটত, পাট জাগ দিত, ধানবোনা এবং ধানকাটার তদারক করত, ... জঙ্গলে ঘেরা মুকুন্দপুরের এই বিজন ভূখণ্ডে একটি পরিপূর্ণ জনপদ গড়ার স্বপ্ন দেখছে। এখানে স্কুল বসবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। লেখাপড়া বা রোগ সারাবার জন্য দূরে কোথাও ছুটতে হবে না।"[১২]

মুকুন্দপুর বাস্তুহারা সমিতি বিনুকে সাত কাঠা জমি দেবার ব্যবস্থা করেছে। শেষ পর্যন্ত বিনুর মধ্যেও এসেছে বিষণ্ণতা, বাস্তুহারা মানুষের অসহায়ত্ব। তাই বুক দিয়ে আগলে যে ঝিনুককে পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে এনেছিল নতুন জীবন দেবে বলে তাকে ধরে রাখতে পারলো না। ঝিনুক শুক্তির মধ্যে খুঁজে নিয়েছে মুক্তি।

কেয়াপাতার নৌকোয় করে ছিন্নমূল মানুষের জীবনসংগ্রাম শুরু হয়েছিল। ঢেউ-এর তালে দুলতে দুলতে তারা নোঙর ফেলার চেষ্টা করছে। রাতারাতি ভিটেমাটি ছাড়া এই মানুষগুলো উপেক্ষিত অনাহুত। শেষ পর্যন্ত ক্যাম্প কলোনি,

মহানগরের ফুটপাত, অথবা মনুষ্যবসতিহীন জঙ্গলময় জায়গায় এরা আশ্রয় নেয়। এদের জন্য সরকারি সাহায্য ছিল শুধু হিসেবের খাতায়। প্রকৃতপক্ষে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। দেশভাগ আমাদের জীবনে এমন এক ক্ষত যার সাময়িক যন্ত্রণা প্রশমিত হলেও দাগ রয়ে গেছে চিরকালীন। আজও অপরাজেয় মানুষগুলির উত্তাল সময়ের অনন্য সংগ্রাম শতধারায় বয়ে চলেছে দণ্ডকারণ্য বা আন্দামান পর্যন্ত। ছিন্নমূল জীবনসংগ্রামী মানুষের ভাসমান ইতিকথা চলমান ও জীবন্ত।

উল্লেখপঞ্জি

১। সমর সেন, "বাবু বৃত্তান্ত", কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১০৬।

২। প্রফুল্ল রায়, 'কেয়াপাতার নৌকো' অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী , প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৬৩, পৃষ্ঠা-২৪৮।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৩২২।

৪। কমল চৌধুরী সম্পাদিত, 'বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক' প্রথম খণ্ড, কলকাতা : পত্র ভারতী, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, বর্তমান সংস্করণ ২০০৯, পৃষ্ঠা-৫৮।

৫। প্রফুল্ল রায়, 'কেয়াপাতার নৌকো' অখণ্ড সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৩।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা-৪১২।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৪২৪।

৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭৫।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭৫।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭৮।

১১। সমর সেন, "বাবু বৃত্তান্ত", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৮।

১২। প্রফুল্ল রায়, 'কেয়াপাতার নৌকো' অখণ্ড সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮৯।

প্রাবন্ধিক পরিচিতি : **ঝুমা নস্কর ভাণ্ডারী** *স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বিদ্যানগর কলেজ*

আলোচ্য 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু জীবনবোধ' গ্রন্থে এক-একটি বিশেষ উপন্যাসসূত্রে তুলে ধরা হয়েছে বিশ শতকের বিভিন্ন সময়ের বিক্ষিপ্ত রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতা, অখণ্ড বঙ্গভূমি সংহারের ছবি এবং দেশ-ভাগের সূক্ষ্ম রাজনীতি।

ISBN 978-81-943963-4-5

9 788194 396345

ANJALI PROKASHANI

অঞ্জলি প্রকাশনী